কমিউনিস্ট ইশতেহার আজও প্রাসঙ্গিক প্রকাশের একশত সত্তর বছর

'দুনিয়ার মজদুর এক হও' ধ্বনি তুলে মার্কস এবং এঙ্গেলস যৌথভাবে ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মাত্র কয়েকপাতার একটি রাজনৈতিক দলিল প্রকাশ করেছিলেন যা–কমিউনিস্ট ইশতেহার বা Communist manifesto নামে পরিচিত। এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তার প্রকাশকালের ১৭০ বছর পূর্ণ হলো। যদিও মার্কসের মৃত্যুর পর এঙ্গেলস লিখেছেন 'ইশতেহার আমাদের দুইজনের যৌথ প্রকাশনা, তবে যে কথা বলা আমার কর্তব্য বলে মনে করি তা হলো এর মৌলিক প্রস্তাবনা, যা হলো মূল অংশ (Ucleus), তা মার্কসের অবদান।' প্রকাশের পর এই একটিমাত্র পুস্তিকা পৃথিবীর ইতিহাসের অগ্রযাত্রাকে যেভাবে প্রভাবিত করেছে তা তুলনাহীন। শুধুমাত্র কমিউনিস্টরাই নয়, এমনকি কমিউনিজমের বিরোধী ইতিহাসবিদদেরও সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন, প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম এই প্রসঙ্গে লিখেছেন–'This small pamphlet is by far the most influential single piece of political writing since the French Revolutionary Declaration of the Rights of Man and Citizen.'

১৮৪৮ সালের প্যারিস বিপ্লবে সর্বহারাশ্রেণি প্রথম তার নিজস্ব দাবি নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছিল আর সেই বিপ্লবের প্রাক মুহূর্তে এই পুস্তিকা দুনিয়ার মজদুরকে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এঙ্গেলস পরবর্তী সময়ে উল্লেখ করেছিলেন যে তাঁরা যখন এই কথা পৃথিবীর সামনে ঘোষণা করেছিলেন 'তখন কিন্তু অতি অল্প কণ্ঠেই তার প্রতিধ্বনি ঘটেছিল'। কিন্তু কালক্রমে আজ এই ধ্বনি সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনে সম্মিলিত আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহারের ইতিহাস

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে যুক্ত হচ্ছেন, সেই সময় ইউরোপে এই সমস্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোর প্রকাশ্যে কাজ করা আইনসম্মত ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এই সংগঠনগুলো ছিল গুপ্ত সমিতি। ১৮৩০ সালে এই রকমই একটি বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি (Bund der Geächteten) প্যারিসে তৈরি হয়েছিল মূলত দেশত্যাগী জার্মান ঠিকামজুরদের নিয়ে, যাদের অধিকাংশই ছিলেন দর্জি ও কাঠমিস্ত্রি। এই গুপ্ত সমিতি ভেঙে League of the Just নাম দিয়ে যে সংগঠন গঠিত হয়েছিল তাদের সাথে মার্কস এবং এঙ্গেলস যুক্ত হন। এই লিগের সদস্যদের মার্কস-এঙ্গেলসের বিপ্লবী উদ্দেশ্য ও করণীয় কর্তব্যের বিশ্লেষণী বক্তব্যের যথার্থতা সম্পর্কে এমন নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মায় যে তাঁরা সংগঠনকে সেই লক্ষ্যে ঢেলে সাজাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সেই অনুসারে ১৮৪৭ সালে 'কমিউনিস্ট লিগ' নাম নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন গঠিত হয়। এই লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডন শহরে। এই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তনুসারে মার্কস এবং এঙ্গেলসকে সংগঠনের উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্মপন্থা হিসেবে বিশদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মসূচি (Detailed theoretical and practical programme) প্রণয়ন করে প্রকাশ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্রাসেলসে বসে মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রস্তুত করেন এবং ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত হয় জার্মান ভাষায়, তারপরে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে।

এই পুস্তিকা প্রকাশের পঁচিশ বছর পরেই মার্কস-এঙ্গেলস অনুভব করেছিলেন যে পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে ইস্তেহারের দুই-এক জায়গা বিস্তৃত করে সমৃদ্ধ করার অবকাশ আছে। ১৮৭২ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় মার্কস-এঙ্গেলস ইশতেহারের এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন। যেমন, মার্কসীয় দর্শন অনুসারে সর্বত্র এবং সবসময় মূলনীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ভর করে বিশেষ সময়ের ঐতিহাসিক অবস্থার উপর। এই বিবেচনায় তাঁরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে যে বিপ্লবী কর্মপন্থার প্রস্তাবনা করেছেন তার উপর বিশেষ জোর দেননি। প্রকাশের পঁচিশ বছর পরেই তাঁরা বলছেন যে 'আজকের সময়ে হলে নানা কারণেই সেই অংশ ভিন্নভাবে লিখতে হতো'। অন্য যে সমস্ত পরিবর্তনের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন তাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই পঁচিশ বছরের মধ্যে তৎকালীন সময়ের আধুনিক যন্ত্রশিল্প বিপুল পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়েছিল, শ্রমিকশ্রেণির পার্টি সংগঠন উন্নত ও প্রসারিত হয়েছিল, প্রথমে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও পরে প্যারি কমিউনের বাস্তব অভিজ্ঞতা শ্রমিকশ্রেণি অর্জন করেছিল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র দুই মাস স্থায়ী হলেও, প্যারি কমিউনের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণি প্রথম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে শ্রমিকশ্রেণি শিখেছিল যে 'একটি তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র শুধুমাত্র হাতে পেলেই শ্রমিকশ্রেণি তাকে ধরে রাখতে পারে না এবং নিজেদের কাজে লাগাতে পারে না।' বিশেষত : প্যারি কমিউনের এই অভিজ্ঞতার তাৎপর্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'সিভিল ওয়ার ইন ফ্রান্স' গ্রন্থে মার্কসের বিস্তৃত আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। এছাড়া, চতুর্থ অংশে সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের আলোচনায় যে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা শুধুমাত্র ১৮৪৭ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সেগুলোর অধিকাংশকেই ইতিহাসের অগ্রযাত্রা ইতিমধ্যেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়েছিল। এইসব কারণে ইশতেহারের কিছু কিছু অংশ সেকেলে হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা সেই সময় অনুভব করেছেন।

কমিউনিস্ট ইশতেহার প্রকাশের পরেই ১৮৪৮ সালের জুন মাসে সংঘটিত হয়েছিল প্যারিস অভ্যুত্থান। সর্বহারা এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে প্রথম মহাসংগ্রাম, যা ব্যর্থ হয়। এই কারণে ইউরোপীয় শ্রমিকশ্রেণির সামাজিক ও রাজনৈতিক আশাকে পুনরায় সাময়িকভাবে পেছনে চলে যেতে হয়। আর, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লড়াই ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের আগে যেমন ছিল তেমনভাবেই চলতে থাকে শুধুমাত্র সম্পদশালী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে। প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল শাসকের আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করল এবং সর্বহারার আন্দোলনের যে কোন রকম সম্ভাবনাকেই নির্মমভাবে দমন করা হতে থাকল। প্রুশিয়ান পুলিশ কমিউনিস্ট লিগের কেন্দ্রীয় অফিস কোলন শহরে খুঁজে বের করে সদস্যদের গ্রেপ্তার করে এবং বিচার শুরু করে, যা ইতিহাসে 'কোলন কমিউনিস্ট বিচার' নামে পরিচিত। ১৮৫২ সালের ৪ নভেম্বর বিচারের রায়ে সাতজন অভিযুক্তকে তিন থেকে ছয় বছরের বিভিন্ন মাত্রায় দুর্গে বন্দি রাখার সাজা দেওয়া হয়। সাজা ঘোষণার সাথে সাথে অবশিষ্ট সদস্যরা লিগকে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মনে করা হয়েছিল লিগের কর্মসূচি হিসেবে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইশতেহারের অবলুপ্তি ঘটাই বুঝি সেই সময়ের স্বাভাবিক পরিণতি।

এরপরে ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণি আবার ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে। 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি' (International Working Men's Association) গড়ে ওঠে। এই সমিতি গড়ে তোলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ এবং আমেরিকার সমস্ত জঙ্গি প্রলেতারিয়েত আন্দোলনকে অভিন্ন সংগঠনের আওতায় এনে একটি সংগঠিত বাহিনী গড়ে তোলা। এই কারণে এই সমিতির কর্মসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হয় যা ইংল্যান্ডের

ট্রেড ইউনিয়নের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে, তেমনি ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি ও স্পেনে প্রুধোঁর এবং জার্মানির লাসালের অনুগামীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। মার্কস নিজেই এই সমিতির কর্মসূচির খসড়া রচনা করেছিলেন। লাসালে যদিও বলতেন যে তিনি মার্কসের 'শিষ্য' (Disciple) এবং সেই হিসেবে 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু লাসালের সাথে মার্কসের মতবাদের পার্থক্য ছিল খুবই মৌলিক, পরবর্তী সময়ে 'ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম'-এ মার্কসের আলোচনায় আমরা যা দেখতে পাই, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লাসালের অনুগামীদের নিয়ে অগ্রসরের উদ্দেশ্যে ইশতেহারের মূলনীতিগুলো তখন 'শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতি'-এর কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণে সেই সমিতির খসড়া মার্কস নিজে রচনা করলেও তখনই ইশতেহারের মূলনীতিগুলো গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৮৯০ সালের জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন যে মার্কসের একমাত্র এবং সম্পূর্ণত (Solely and exclusively) আস্থা ছিল যে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণির সচেতনতা বিকাশ ঘটবে (as it necessarily had to ensure from united action)। পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই এবং সেই লড়াইয়ের নানা উত্থান-পতন, যত না জয়ের ঘটনা তার চেয়েও পরাজয়ের ঘটনা শ্রমিকের মুক্তির যথার্থ পরিস্থিতি সম্পর্কে সংগ্রামী শ্রমিকদের মন (Make theirs mind more receptive to a thorough understanding of the true conditions for the emancipation of the workers) তৈরি করে দিয়েছিল বলে এঙ্গেলস উল্লেখ করেছেন। প্রথমে শ্রমিকশ্রেণির বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটাতে হবে, তারপর লড়াইয়ে যেতে হবে–সেটা হলো ভাববাদী চিন্তা। লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শ্রেণিসংস্কৃতি ও শ্রেণিচেতনা ক্রমশ ইস্পাতদৃঢ় চরিত্রের আধার হয়ে ওঠে, প্রথমে ইস্পাতদৃঢ় চরিত্র তৈরি করে তারপর লড়াইয়ের ময়দানে যাওয়ার কথা বস্তুবাদীরা বলেন না। এঙ্গেলস বলেছেন, মার্কস যে যথার্থই ভেবেছিলেন তার প্রমাণ হলো যে, দেখা গেল '১৮৬৪ সালে আন্তর্জাতিক সৃষ্টির সময় শ্রমিকেরা যে অবস্থায় ছিল তা থেকে একেবারে ভিন্ন মানুষ হয়ে তাঁরা বেরিয়ে আসেন ১৮৭৪ সালে, যখন আন্তর্জাতিক ভেঙে যায়।'

এইভাবেই নানা প্রকার ভ্রান্ত মতবাদ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণি ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। ফ্রান্সে প্রুঁধোর চিন্তা, জার্মানিতে লাসালের চিন্তার প্রভাব নিতান্তই দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি ইংল্যান্ডের রক্ষণশীল ট্রেড ইউনিয়নও ইশতেহারের মূলনীতির বিরোধিতা থেকে সরে আসে। পৃথিবীর সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে 'ইশতেহার'-এর নীতিগুলো ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশ্ব শ্রমজীবী শ্রেণির রাজনৈতিক দলিল হিসেবে 'ইশতেহার' আবার প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে এবং সামনের সারিতে এসে দাঁড়ায়। অসংখ্য ভাষায় তা অনূদিত হতে থাকে, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৮ সালের ভূমিকায় এঙ্গেলস উল্লেখ করছেন—'এই কারণে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিফলন অনেকাংশেই 'ইশতেহার'-এর ইতিহাস; নিঃসন্দেহে বর্তমান সময়ে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত অংশে প্রচারিত, সকল সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রকাশিত, সাইবেরিয়া থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের কাছে স্বীকৃত সাধারণ প্ল্যাটফর্ম হলো 'ইশতেহার'।'

মার্কস এবং এঙ্গেলস যখন ইশতেহার রচনা করেন, তখন একে সমাজতন্ত্রের ইশতেহার না বলে কেন 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' নাম দেওয়া হয়েছিল তার একটা ব্যাখ্যা এঙ্গেলস দিয়েছেন। সেই ব্যাখ্যাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে তা আমাদের তৎকালীন আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের রূপ বুঝতে সাহায্য করে। এঙ্গেলস লিখেছেন 'তথাপি এইটি যখন লেখা হয়েছিল, আমরা তাকে সমাজতান্ত্রিক ইশতেহার বলতে পারিনি। ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী বলতে বোঝাত একদিকে বিভিন্ন কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুগামীজনদের, ইংল্যান্ডে ওয়েনপন্থিদের, ফ্রান্সের ফুরিয়েরপন্থিদের–উভয় ধারাই তখন সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ক্রমেই লোপ পাচ্ছিল; অন্যদিকে বোঝাত বহুবিধ সামাজিক হাতুড়েদের, যাঁরা পুঁজি এবং মুনাফার জন্য বিপদের কোন কারণ না ঘটিয়ে নানাপ্রকার মেরামতির মাধ্যমে সামাজিক ক্ষোভগুলোর প্রতিবিধানের কথা ঘোষণা করত। উভয় ক্ষেত্রের লোকেরাই ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বাইরের এবং তাদের দৃষ্টি থাকত শিক্ষিত শ্রেণির সমর্থনের দিকে। শ্রমিকশ্রেণির যে অংশের মধ্যে নিছক রাজনৈতিক বিপ্লবের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে প্রত্যয় জন্মে ছিল এবং সমাজের আমূল বদলের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করত, তাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে পরিচয় দিত। অবশ্য এ ছিল স্থূল, অসংস্কৃত ও একেবারেই প্রবৃত্তিজাত ধরনের কমিউনিজম; তথাপি এতে সার কথাটা ধরা পড়েছিল এবং শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে এদের যে শক্তি ছিল তা ফ্রান্সে কাবে (Cabet)-এর এবং জার্মানিতে ভাইটলিং (Weitling)-এর মতো কাল্পনিক কমিউনিজমের জন্ম দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তাই ১৮৪৭ সালে সমাজতন্ত্র ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন আর কমিউনিজম ছিল শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন। অন্তত ইউরোপ মহাদেশে সমাজতন্ত্র ছিল 'মান্যগণ্য' ব্যাপার, আর কমিউনিজম ছিল ঠিক তার বিপরীত। আর প্রথম থেকেই যেহেতু আমাদের ধারণা ছিল যে 'শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি হবে শ্রমিকশ্রেণির নিজেরই কাজ', তাই এই দুই নামের মধ্যে কোনটা আমরা নেব সেই বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না।'

বর্তমান সময়ে ইশতেহারের প্রাসঙ্গিকতা

এই ঐতিহাসিক পুস্তিকা প্রকাশের পর ১৭০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। পৃথিবীতে মানবজাতি ইতিহাসের অনেক উত্থান-পতন প্রত্যক্ষ করেছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজ-রাজনীতি-সংস্কৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থির হয়ে নেই। তবু দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের কাছে সেই পুস্তিকার গুরুত্ব আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠে আসে যে এত বছর পরেও কীঅর্থে এবং কীভাবে এই পুস্তিকা প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে? আমরা আগেই উল্লেখ করেছি প্রকাশের ২৫ বছর পরেই সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে ইশতেহারের কোন কোন অংশ অনুপযোগী বা অপ্রযোজ্য হয়ে উঠেছিল সে কথা মার্কস-এঙ্গেলস নিজেরাই উল্লেখ করেছিলেন। তবু ইশতেহারের প্রাসঙ্গিকতা কোথায় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে 'গত পঁচিশ বছরে বাস্তব অবস্থা যতই বদলে যাক না কেন, এই 'ইশতেহার'-এ যেসব সাধারণ নীতি (General Principles) নির্ধারিত হয়েছিল তা আগে যেমন সঠিক ছিল, আজকেও তাই আছে।' ১৭০ বছর পরে আজকে আমরা যদি দেখি তবে দেখব যে সেই সাধারণ নীতিগুলো এখনো সঠিক এবং সেই কারণেই ইশতেহারের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা আজও অম্লান।

কী ছিল সেই সাধারণ নীতি? ইতিহাসের প্রতিটি যুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং তা থেকেই আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠা সমাজের কাঠামো সেই যুগের রাজনৈতিক ও ভাবজাগতিক (Political and Intellectual) ইতিহাসের মূলভিত্তি রচনা করে। ফলস্বরূপ, জমির আদিম যূথভুক্ত মালিকানাধিকার

অবসানের পর থেকে সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, শোষক আর শোষিতের লড়াইয়ের ইতিহাস, অধীনস্ত শ্রেণি ও অধিপতি শ্রেণির লড়াইয়ের ইতিহাস। কিন্তু এই লড়াই ও বিরোধ আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শোষণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও শ্রেণিসংগ্রাম থেকে গোটা সমাজকে চিরকালের মতো মুক্ত না করে, শোষিত ও নিপীড়িতশ্রেণি (প্রলেতারিয়েত বা সর্বহারাশ্রেণি) নিজেকে শোষক ও নিপীড়কশ্রেণির (বুর্জোয়াশ্রেণির) কবল থেকে মুক্ত করতে পারে না। এটাই হলো মার্কসের মৌলিক ভাবনা যা কমিউনিস্ট ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা আজও সমানভাবে কার্যকরী।

একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে খুবই উল্লেখযোগ্য। তা হলো এই যে, ১৮৭২ সালে জার্মান সংস্করণ যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন মার্কস এবং এঙ্গেলস দুইজনেই জীবিত। তাঁরা সেই সংস্করণের ভূমিকায় উল্লেখ করছেন যে, কমিউনিস্ট ইশতেহারের অনেক বিষয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, কোন কোন বিষয় রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে সেকেলে হয়ে পড়েছে। তাহলে সেই সব জায়গায় তাঁরা সংশোধন, সংযোজন ইত্যাদি করলেন না কেন? তাঁরা বলছেন, তা তাঁরা করতে পারেন না, তা করার অধিকার তাদের নেই, যেহেতু ইতিমধ্যেই সেটি ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হয়েছে। আমরা একই রকম নৈতিকতার মান দেখেছি মার্কসের মৃত্যুর পর তাঁর ফরাসি ভাষায় ১৮৪৬-৪৭ সালের শীতকালে লেখা 'পভার্টি অব ফিলজফি' গ্রন্থের জার্মান অনুবাদ যখন এঙ্গেলসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে ১৮৮৪ সালে। ১৮৪৬-৪৭ সালে মার্কসের লেখায় কিছু ধারণায় অসম্পূর্ণতা ছিল, অস্বচ্ছতা ছিল যা তিনি 'পুঁজি' গ্রন্থ লেখার সময় সম্পূর্ণ করেন। সম্পাদনার সময় এঙ্গেলস যেমন ছিল তেমনই রেখেছেন–কোন অংশ বাদ দেওয়া, কোথাও কিছু জুড়ে দেওয়া এইসব করেননি। তার পরিবর্তে তিনি দীর্ঘ ভূমিকার শেষে লেখেন 'It is hardly necessary to point out that the terminology used in this work does not entirely coincide with that in Capital.'

আজকে আমরা যখন কোন বামপন্থি বা মার্কসবাদী হিসেবে দাবি করা দলের দলিল কারচুপি করার ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, তখন কমিউনিস্ট ইশতেহারের কথা স্মরণ করতে পারি। কোন ব্যক্তিকে মহান বানাতে বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অথরিটি বানাতে গিয়ে ঐতিহাসিক দলিলের কারচুপি করা হচ্ছে। তিনি নেতা যা বলেছেন তা বাদ দেওয়া হচ্ছে, যা বলেননি তা ঢোকানো হচ্ছে। ২০০৬ সালের রচনাবলিতে প্যারাগ্রাফ ঢুকিয়ে দিয়ে যেমন দাবি করা হচ্ছে ১৯৪৮ সালের লেখায় ছিল, তেমনি আবার ১৯৫৬ সালের দলিল থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দিয়ে ভিন্ন অর্থ তৈরি করে দাবি করা হচ্ছে 'তিনিই প্রথম ১৯৫৬ সালে বলেছিলেন'। শুধু তাই নয়, জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে এমন সব দাবি করা হচ্ছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা মিথ্যা দিয়ে কোন মহৎ কাজও কোনদিন হয়নি। ফলে যে কোন বামপন্থি দলের সম্ভাবনাময় তরুণ কর্মীরা এই সব ঘটনার নিরিখে দলের চরিত্রটি বুঝতে চেষ্টা করবেন আশা করা যায়। কমিউনিস্ট ইশতেহার আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।